একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: বাংলা কবিতায় ‘জয়বাংলা’ ধ্বনিতে আত্মজাগরণ

ভাস্কর সেন গুপ্ত

‘জয়বাংলা’ স্লোগান পাকিস্তানের পরাজয়ের আরেক নাম।

“জয়বাংলা’ বাংলার জয়,
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময়।।” [১]

‘জয়বাংলা’ সাধারণ ভাবে একটি স্লোগান মাত্র। কিন্তু এই স্লোগান এতটা ঝাঁঝালো বিশ্ব আন্দোলিত হয়। এই একটি স্লোগানে দেহ-মনে শিহরণ জাগে, আলোড়ন উঠে রক্তে; মুষ্টিবন্ধ হাত উর্ধ্বে উঠে শপথের কোলাহলে। মুক্তিযুদ্ধে পূর্বপর এই স্লোগান বীর বাঙালিকে অলৌকিক শক্তিতে মাতিয়ে রেখেছে। রক্তে অজানা এক চেতনার আগুন টগবগ হয়ে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছে।

৪৭-এর পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার-নির্যাতন-বৈষম্য অসহ্য হয়ে ওঠে। বাঙালির ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাতে দরকার এক অমর ধ্বনি। যে ধ্বনি জাগিয়ে তুলবে আর নতুনের পথে চলায় সহায়তা করবে। জ্বলে উঠবে আগুন মনে; জাগিয়ে তুলবে দৃঢ় সংকল্পে। বাঙালি পেয়ে যায় তাদের রুদ্রধ্বনি ‘জয়বাংলা’! যে ধ্বনি বাঙালিকে অকুতোভয় করে তুলে। বাঙালির চেতনাকে করেছে শানিত; প্রাণে যুগিয়েছে যুদ্ধে যাওয়ার সাহস। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি বাঙালির মহান মুক্তি আন্দোলনের প্রাণশক্তি হয়ে ওঠে । দিনে দিনে এ ধ্বনি হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধাদের অদম্য শক্তির প্রতীক; আর বাঙালির দেশপ্রেম প্রকাশের প্রতিধ্বনি।

‘জয়বাংলা’ বীর বাঙালির প্রাণের ধ্বনি; বাঙালির জাগরণের নতুন স্পন্দন। ‘জয়বাংলা’ প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত এক অমর ধ্বনি, হৃদয়ের ধ্বনি; ‘জয়বাংলা’ বাঙালির মুক্তির ধ্বনি; ‘জয়বাংলা’ শত্রুকে পরাজয় করার ধ্বনি; ‘জয়বাংলা’ সুদীপ্ত সাহসের ধ্বনি; ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি সত্য-সুন্দরের ধ্বনি। এ কথা সত্য, বাঙালিকে সাতচল্লিশের পর থেকেই পাক-বিরোধী স্লোগান মুখে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলতে হয়েছে বার বার কিন্তু ‘জয়বাংলা’-র আগে এমন তীব্র, সংহত ও তাৎপর্যপূর্ণ স্লোগান আর ব্যবহার করেনি। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনিতে বাঙালির রাজনীতি, সংস্কৃতি, দেশ, ভাষার সৌন্দর্য ও জাতীয় আবেগ প্রকাশ

পেয়েছে। এই ধ্বনি বাঙালির প্রেরণা আর চেতনায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় প্রথম 'জয়বাংলা'-র কথা বলেছেন। এই উচ্চারণ সত্যি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে হয়তো কবিও কোনদিন ভাবেননি। 'জয়বাংলা'-র প্রথম ব্যবহার নিয়ে মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর প্রবন্ধে বলেন :

> "কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ থেকেই তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছিল। ১৫ তারিখ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির মঞ্চ মধুর ক্যান্টিনে সাধারণ ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভা চলাকালীন একপর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আফতাব উদ্দিন আহমদ চিৎকার করে স্লোগান দিয়ে উঠেন 'জয়বাংলা' বলে। ঘটনার আকস্মিকতার রেশ কাটিয়ে উঠে ইকবাল হলের আরেক শিক্ষার্থী চিশতি শাহ হেলালুর রহমানও চিৎকার দিয়ে উঠেন 'জয়বাংলা' বলে। মধুর ক্যান্টিনে বসে আকস্মিকভাবে 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে উঠা এই ছাত্ররা হয়তো নিজেরাও জানতো না এই স্লোগান পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ভেঙ্গে জন্ম দেবে স্বাধীন বাংলাদেশের।"[২]

'জয়বাংলা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে। বাংলা কবিতাও এর বাইরে ছিলো না। কবিগণ সমাজ ও সময় সচেতন বলে তাদের কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে 'জয়বাংলা' ধ্বনি। কবিতায় 'জয়বাংলা' এক নতুন মাত্রা দান করেছে। বাংলার রূপকল্প এঁকেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৯ সালে "বাংলাদেশ" শিরোনামে কবিতায়, ৭১-এ স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর আগে।

"নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর॥

... ...

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে,
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর॥"[৩]

কবিতায় কবি নজরুল ষড়ঋতুর বাংলাকে এঁকেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রূপকল্পের বাস্তবায়ক। কাজী নজরুল হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্য থেকে বাংলাকে অঙ্কন করেছেন হৃদয়ের গভীর কল্পনায়। 'বাংলার বাঙালির হোক', বাংলার জয় হোক, 'বাঙালির জয় হোক' সেই কল্পনাতেই ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা, আমাদের সোনার বাংলা। ১৯২২ সালে কবি বাংলার অমর ধ্বনি, সোনার বাংলার স্বপ্ন স্লোগান লিখেছেন তার কল্পনার স্বপ্নজালে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায়:

"ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নিনিমিখ।
জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ!
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!"[৪]

শিহাব সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'জয়বাংলা' স্লোগানের কথা বলতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নজরুলের কথা বলেন। আর এই স্লোগানের সাথে কবি কাজী নজরুল অন্তরিক ভাবে জড়িত। শিহাব সরকার 'নজরুলকে মনে পড়ে' কবিতায় কাজী নজরুল ও মুক্তিযোদ্ধা নজরুলকে 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে মিলিয়ে দিয়েছেন। কবির উচ্চারণ :

'বাংলার বাঙালি' দুটি শব্দের অম্লান যাদু!

... ...

আখাউড়ার কাছে একাত্তরে যখন মেশিনগানে
ঝাঁজরা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল
নজরুল কী শেষবার বলতে পেরেছিল
'জয় বাংলা'?"[৫]

মুক্তি আন্দোলনের সময় থেকে বাঙালি 'জয়বাংলা' ছাড়া অন্য কোন স্লোগান ব্যবহার করেনি। কিন্তু ১৯৭৫এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তে ভেজা বাংলায় পাকিস্তানের দোসররা 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান ব্যবহার করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি বলেই 'জিন্দাবাদ' স্লোগান আজ আমাদের থেকে দূরে। আর প্রতিটি প্রকৃত বাঙালি এটাও আশা করে যে, পাকিস্তান থেকে আমদানীকৃত এই স্লোগান যেন বাংলার বুকে কোনদিন জাগ্রত না হয়। বাঙালি

প্রতিটি প্রজন্ম যেন গর্বের সাথে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিতে পারে। গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের উচ্চারণ :

“বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
‘জয়বাংলা’ বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।।[৬]

যে স্লোগানে বাঙালি পেলো স্বাধীনতা সে স্লোগান বাঙালির হৃদয়ে গাঁথা। উনসত্তরের এগারো দফাতে গণআন্দোলনে, সত্তরের নির্বাচনে আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত হয়েছে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান। রক্তে আন্দোলনের তুমুল আলোড়ন তুলেছে সেদিন। সেদিনের জাতির উত্থানকে স্মরণ করে কবি বেলাল চৌধুরী জন্ম দিয়েছেন এক অমর কবিতা ‘একদিন চিরদিন জয়বাংলা’:

“জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন দুর্বার এক সংগ্রামের নাম
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন আট কোটি কোকিলের সম্মিলিত ঐকতান
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন কল্লোলিত সমুদ্রের উত্তাল গর্জন
... ...
জয়বাংলা আছে আজো বাঙালির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
... ...
জয়বাংলা আবহমান বাংলা ও বাঙালির বিজয় অভিযানের নাম...।” [৭]

শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়- একটি দেশ, একটি পতাকা, একটি জাতির স্বপ্নদষ্টা। তিনি বাংলাদেশ নামক দেশের ইতিহাস স্রষ্টা, বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয়া লাল সবুজের পতাকা উত্তোলিত নতুর দেশ, রক্তসিন্ধু অভ্যুদয়ের কর্ণধার। যাঁর ‘জয়বাংলা’র স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর বজ্রকণ্ঠে কেঁপে গিয়েছিল পাকিস্তানের ভিত। চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু। তাঁর মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে বেলাল চৌধুরীর কবিতায়:

“একদিন যাঁর বজ্রকণ্ঠে হাঁকে
ফুঁসে উঠেছিল সব ক’টি নদী,
একদিন যাঁর একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে

গর্জে উঠেছিল আসমুদ্র হিমাচল,
যিনি বিজয়ের ডাক দিয়েছিলেন
সমুদ্রের সমস্ত ধ্বনিকে একত্র করে
আকাশ-পাতাল মেদিনী কাঁপিয়ে
পুঞ্জীভূত 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে...।"[৮]

বাঙালি পৃথিবীর সবচাইতে গর্বিত জাতি। তাদের দখলে রয়েছে পৃথিবীতে সারা জাগানো মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর মাঝে এটি একটি। পৃথিবীর মানচিত্রে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম'।এ এক শিল্পিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হানাদারের হিংস্র থাবায় বাংলা পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে; দেশে বিরাজ করেছে কবরের নিস্তব্ধতা। খালিদা এবিদ চৌধুরীর কবিতায় তিনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধের সেই স্বপ্নের দিনগুলোর কথা বলেছেন। মুক্তি আন্দোলনের জন্য বাঙালি যোজন যোজন পথ হেঁটেছে; তাদের পিছনে শক্তি যুগিয়েছে একটি ধ্বনি :

"হে যুদ্ধ, তুমি স্বপ্ন এবং জীবন
তুমি অশ্রু এবং পতাকা
তুমি গোলাপের কুঁড়ির মতো বারুদ ছড়াচ্ছো
অন্ধকারে, আলোতে, নদীতে জলস্রোতে-
... ...
আমারে বুকের ভেতর এখন লালনের সুর
আমার বুকের ভেতরে রাবীন্দ্রিক চেতনা
আমি রক্তাক্ত রাজপথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
চলে এলাম-আমাদের লঞ্চটা এখন
নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে-
আমাদের সঙ্গে এখন জয়বাংলা..."[৯]

'জয়বাংলা' বাংলার প্রাণ। 'জয়বাংলা' মানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মধুসূদন আর বঙ্কিমের হৃদয়ানুভূতি; 'জয়বাংলা' মানে লালন-হাছন-বিজয় কিংবা জালালের মরমি গান। 'জয়বাংলা' মানে বিষাদ সিন্ধু করুণ সুর, জয় বাংলা মানে বিদ্রোহী কবিতার বিদ্রোহ; জসীমউদ্‌দীনের গ্রাম, জীবনানন্দের প্রকৃতি। 'জয়বাংলা' মানে রবীন্দ্রনাথের দর্শন আর গান; পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওইয়া কিংবা ধামালের বাণী। 'জয়বাংলা' মানে ডিএল রায়, রজনীকান্ত, গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরীর দেশের গান।

'জয়বাংলা' মানে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি', 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন', 'বন্দী শিবির থেকে', 'আত্মকথা-১৯৭১', 'ধ্বংসের কাছে থাকি', 'বাংলা ছাড়ো',

‘যে জলে আগুন জ্বলে’ কিংবা ‘মুক্তি আন্দোলনের কবিতা’, ‘মুক্তি আন্দোলনের পঙ্‌ক্তিমালা’।’জয়বাংলা’ মানে, বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; জয় বাংলা মানে তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা; জয় বাংলা মানে ‘কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবা না।’ জয় বাংলা মানে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’।

‘জয়বাংলা’ ধ্বনিতে আছে ঘুমপাড়ানী সুর, আবার দ্রোহের দামামা। মধুর এ সুরে দুই বাংলা যেন এক হয়ে মিলেছে এক প্রাণে। মানস চৌধুরী ‘জয়বাংলা’ ধ্বনিকে আহ্বান মনে করেন। ‘জয়বাংলা’ এই গান’ কবিতায় কবি বাংলাকে খুঁজে পান জীবনের স্মৃতিময় ঘটনায়। এ ধ্বনিতে আছে প্রেম-কষ্ট-দ্রোহ-শপথ। কবির উচ্চারণ :

"‘জয়বাংলা’ এই গানে এপারে ওপারে ঘুম ভাঙ্গে।
‘জয়বাংলা’ এই গান এই দুই প্রান্ত রক্তস্রোতে এক হয়ে যায়
... ...
আমৃত্যুর লড়াই চলছে প্রতিটি রাস্তার বাঁকে, এদেশ ওদেশ
প্রতি প্রাণের সর্বত্র
‘জয়বাংলা’ গান শুনি একবার বিদায় দে মা ...’ এই
দৃপ্ত সুর বেজে ওঠে।”[১০]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক আদর্শিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধ পলাশির প্রান্তরের অসাহায়ত্ব নয়। এ যুদ্ধে আমরা চেয়ে চেয়ে পরাজয় দেখিনি। এ যুদ্ধে আমরা রক্ত দিয়ে রক্তের মান রেখেছি। এই যুদ্ধ বাঙালি তাদের চেতনার রঙে রাঙিয়ে, জয়বাংলা ধ্বনিতে মাতিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১; যুদ্ধ শেষ। সবার এখন ঘরে ফেরার পালা। তাইতো ১৭ ডিসেম্বর থেকে স্রোতের মতো সবাই ফিরে আপন ঠিকানায়; নাড়ির টানে। ঘরে ফিরছে মুক্তিযোদ্ধ, সেনা, গেরিলা, উদ্বাস্তু, কিংবা মা-বোন। ঘরে ফিরেছে নির্যাতিতা কিশোরী-যুবতী-নারী। তাদের বুকে জেগেছিলো একটি জয়ধ্বনি ‘জয়বাংলা’। মোহাম্মদ রফিক তাঁর ‘রোকসানা ও রোকসানা’ কবিতায় লিখেছেন :

“দুঃসাধ্য বলে দুঃসাধ্য : উঠে আসছিল পরস্পর হুমড়ি খেয়ে,
তালগোল পাকানো হাত-পা নাড়ছিল কি নাড়ছিল না, চোখের
মণি কোনো তাপে বা উত্তাপে ঠিকরে পড়ছিল কি না স্বাধীনতা,
মুর্হুমুহু: জয় বাংলা বিঁধছিল ভোঁতা পিন ঘা ভর্তি সারা অঙ্গে;”[১১]

বাংলার শ্যামল মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, বন-বনানী, সমতল-পাহাড় তথা টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দিগন্ত কাঁপিনো এই 'জয়বাংলা' অগ্নিঝরা ধ্বনি। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গর্জনের মতো রণহুঙ্কার এই 'জয়বাংলা'। যে হুঙ্কারে বাঙালি কাঁপিয়েছে পাকিস্তানের হৃদপিণ্ড থেকে রাওয়ালপিণ্ডি। একাত্তরের যুদ্ধ হয়েছে 'জয়বাংলা'-র অনুসারী বনাম কুখ্যাত 'জিন্দাবাদ' অনুসারী। এই অলৌকিক ধ্বনির শক্তিতে পাক অপয়াদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে।রবিউল হুসাইন-এর 'লাশ ও লিঙ্গ' কবিতায় মুক্তিযুদ্ধাদের চেতনাকে তুলে ধরেছেন। কবিতায় উচ্চারণ:

"উলঙ্গ খানসেনারা আমাদের উলঙ্গ মা-বোনদের
দেহ লেপটে রক্ত, বৃষ্টি, বীর্যের ভেতর পড়ে আছে।
সবাই মৃত। ও তখন হঠাৎ 'বুবু গো' বলে এক
মৃত মহিলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, ...

... ...

... তারপর বুকের ঠিক
মাঝখানে রাইফেলের বেওনেট খাড়া করে
জোরে ঢুকিয়ে, 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার দিয়ে
সেই বৃষ্টির ভেতর দৌড়ে দৌড়ে একটি
জলবিন্দুতে মিশে গেল।" [১২]

একাত্তরের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু 'জয়বাংলা', 'জয় পাকিস্তান' বলে বক্তব্য শেষ করেন। তারও আগে এক জনসভায় বক্তব্য শেষ বলেন জয় সিন্ধু, জয় পাঞ্জাব, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় পাকিস্তান বলে সবার শেষে 'জয়বাংলা' বলেন। ৩ মার্চ পল্টনের এক বিশাল ছাত্র পরিষদের সভার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা এবং কর্মসূচি আকারে একটি ইশতেহার তৈরি করা হয়। এই ইশতেহারের শিরোনাম দেওয়া হয় 'জয়বাংলা- ইশতেহার নং এক'।"সত্তরের নির্বাচনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে ছাপানো এক প্রচারপত্রের শেষে 'জয়বাংলা' স্লোগান নিয়ে একটি বাণী লেখা ছিল। বাণীটিতেই ফুটে উঠেছে কত আবেগ, কত ভালোবাসা আর ত্যাগের প্রস্তুতি জড়িয়ে ছিল এই স্লোগানের সাথে।"[১৩] সে সভায় শেখ মুজিব উপস্থিতি হতেই লাখোকণ্ঠে 'জয়বাংলা' স্লোগানে প্রকম্পিত হয় পল্টন ময়দান। সে ধারাবাহিকতায় ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে শেষে বলেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 'জয়বাংলা।" [১৪]

শিহাব সরকার ‘জ্যোতির্ময় তর্জনী’ কবিতায় ৭ মার্চের ঐতিহাসিক সেই সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন :

“সমুদ্রগভীরের অগ্নিগিরি আর স্বপ্নের খনি
থেকে উঠে এসছিল জয়বাংলা ধ্বনি
পৃথিবীর সব সাগরের গর্জন
বেজেছিল সেদিন তাঁর কণ্ঠস্বরে,
যা কিছু আমাদের ছোচ-বড় অর্জন-
গোপন চাবি ছিল ওই মহামানবের স্বর।” [১৫]

যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন বাংলার সামনে ছিল শত প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা, লোভ-লালসা, বাঙালির আত্মকলহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব দূর হয় মুক্তি আন্দোলনের নামে। ‘জয়বাংলা’ হয়ে উঠেছে বাঙালির আদর্শ; ‘জয়বাংলা’ হয়ে উঠলো মুক্তির উৎস। ‘জয়বাংলা’ বাঙালির আত্মপরিচয়-জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। শত বঞ্চনাতেও ‘জয়বাংলা’ চির জাগ্রত, অম্লান।

দুই বাংলার কবি তাঁদের কবিতায় এই অমর স্লোগানটি উচ্চারণ করেছেন বারংবার। বিজয়কুমার দত্তের ‘কোন এক মুক্তিফৌজের ডাইরী থেকে’, সামসুল হকের ‘মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল’, কবিরুল ইসলামের ‘আজ খুব কাছে’, ফণিভূষণ আচার্যের ‘বাংলার অপরূপ রূপ’, ত্রিদিব দস্তিদারের ‘যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কবিতা’, মনিক রহমানের ‘গডফাদার’, প্রদীপ মিত্রের ‘রক্তের আহ্বান’,

এক. “মৃত্যুর চেয়েও কোন ধ্রুবতর আলোকস্তম্ভের
অভিমুখে ছুটে যাই, এই রক্ত সমুদ্রের স্রোতে,
আপাতত কূল নেই, মাথার উপর তীব্র সাইক্লোন ছোটে
মাংসাশী হাঙ্গর ভাসে ডাইনে-বাঁয়ে, জলের গভীরে-
তবু সাঁতরে চলে যায়’- জয় বাংলা ধ্বনির শপথে।” [১৬]

দুই. মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল, স্নান কর নির্মল নদীতে
জোয়ারের ছাপায়- কুল লাল জয়- বুক থেকে টাটকা প্রবাহিত
নদীর উপরে নৌকা, গান ওঠে জয়বাংলা,
দস্যু কেঁপে ওঠে;
মা গো, শুধু তোর জন্যে ঘাট জুড়ে সূর্য-গলা লক্ষ পদ্ম ফোট
মা, তুইপাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল আমাদের রক্তের নদীতে।” [১৭]

তিন. “মনে হচ্ছে- বাংলাদেশ আজ খুব কাছে
কোটি কণ্ঠে ‘জয়বাংলা’ লাল
অভিজ্ঞতা হয়ে আছে
মনে হচ্ছে রমনা খুব কাছে।
হস্তামলকীবৎ বস্তুত ভূগোল
আমাদের করধৃত।
মানুষে মানুষে তবু দুস্তর প্রবাসী
চতুর্দিকে অনাত্মীয় সমুদ্র কল্লোল।”[১৮]

চার. “মা তোর উঠোন জুড়ে ফুটে আছে উৎসুক মাতাল
‘জয়বাংলা’ উচ্চারণের প্রান্তরে প্রান্তরে তোর
লক্ষ সড়কে ছুটছে জয়পত্র শিরে বাঁধা অশ্বমেধে
… … …
এ নব যৌবনের পদ্মার ঢেউয়ে ভাঙ্গে দুর্গের দেয়াল
‘জয়বাংলা’ মন্ত্র আজ বাজে প্রতি রক্ত-কণিকায়
লক্ষ শিমুলের ফুল হৃদপিণ্ডের মতো তোর মাটিতে এমন
মৃত্যুর মোহন রূপ কখনো দেখিনি
এমন সুন্দর তোকে কখনো দেখিনি।”[১৯]

পাঁচ. “যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কবিতাকে আমি
শত্রু বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করেছিলাম
রক্তাক্ত কবিতাটি জয় বাংলা, জয় বাংলা বলে
একটি তীব্র স্বরের মধ্য দিয়ে অনবরত শত্রুদের
তাড়িয়ে যাচ্ছিল
… … …
হাত থেকে রাইফেলের উদাত্ত গর্জন
আর বিজয়ী পতাকার কাঁপন
রক্তাক্ত দেহে কবিতাটি তখনো চলছে…
… … জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা …”[২০]

ছয়. “অথচ চোখের সামনে ভাসতে থাকে,

সেই মুক্তি আন্দোলনের দিনগুলো।
জয় বাংলার ধ্বনি, জয় বঙ্গবন্ধু,
‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে’
‘পথে আমার নাম সাথী’,
মনে পড়ে সমস্ত কিছুই আমার।”[২১]

সাত. “আড়িয়াবাজার ক্যাম্পমুখি
মাসুদের মিছিলের উচ্চরোল, তার
রক্তের আহ্বান যেন সাঁজোয়া বাহিনী।
মুক্তির প্রথম সনদ ও স্বাক্ষর ‘মুজিবনগর’।
‘জয় বাংলা’ তার উদদ্দোমিত-আন্দোলিত
প্রাণের বিশাল উদ্দামতা। মাথায় গামছা বাঁধা
বুক স্বাধীনতা, স্বাধীনতা এই শব্দে দীপ্ত ও চিরসবুজ।” [২২]

আট. আমরা করেছি জয় জীবনের জটিল ভূগোল,
কেউ কি পেরেছে আমাদের মতো
জয়ী হতে? কেউ কি পেরেছে আমাদের মতো উঁচু হতে?
আমরা জয়ের জাতি,
জয় ছাড়া আমরা বুঝি না অন্য কিছু অন্য কোন
মানে, এই জনপদে তাই ‘জয় বাংলা’ অমর স্লোগান।
‘জয়বাংলা’ মানে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি,
‘জয়বাংলা’ মানে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা।”[২৩]

‘জয়বাংলা’ বাঙালির শক্তির উৎস। ‘জয়বাংলা’ মানে মুক্তি। ‘জয়বাংলা’ মানে আমার মাকে মা বলে ডাকা; ‘জয়বাংলা’ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো; ‘জয়বাংলা’ মানে মাথা নত না করা; ‘জয়বাংলা’ মানে দেশের জন্য অস্ত্রধরা। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি মুখে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অটল থাকেছেন। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি মুখে নিয়ে বুকের তাজা রক্তে মাতৃভূমি ভিজিয়েন; ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি মুখে নিয়ে বাঙালি স্বাধীনতাকে মায়ের বুকে তুলে দিয়েছেন। জয় বাংলা ও বঙ্গবন্ধু ছিল মুক্তির প্রেরণার উৎস। তাইতো বাঙালি আজও জয়ধ্বনি দেয় ‘জয়বাংলা’ বলে।

‘জয়বাংলা’ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অঙ্গীকার। এই ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি মুখে নিয়েই পাক হানাদার হটিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়েছে। বেইমান ‘জিন্দাবাদ’ ধ্বনিকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু আজও যদি কেই এই ধ্বনি মুখে আনে, তবে বাঙালির পক্ষ থেকে একটাই কথা :

“ আমার বুকেই ফিরেয়ে নেব
ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;
তুমি আমার জলেস্থলের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাংলা ছাড়ো।।”[২৪]

তথ্যনির্দেশ

১. গাজী মাযারুল আনোয়ার, ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান’, জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১৭, পৃ. ১৩০

২. আহমদ মহিউদ্দিন, ‘জাসদের উত্থান পতনঃ অস্থির সময়ের রাজনীতি’, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৪, পৃ. ২৬-৩৭

৩. ইসলাম কাজী নজরুল, ‘নজরুল রচনাবলী’(চতুর্থ খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১১, পৃ. ১৩৪

৪. ইসলাম কাজী নজরুল, ‘ভাঙার গান’, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-২০০৯, পৃ. ১০

৫. সরকার শিহাব, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’, আবুল হাসনাত (স), অবসর, ঢাকা, অষ্টম মূদ্রণ-২০১৮, পৃ.২৩৮-২৩৯

৬. মজুমদার গৌরীপ্রসন্ন, ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান’, জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১৭, পৃ. ১৩২

৭. চৌধুরী বেলাল, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’, আবুল হাসনাত (সম্পা.), অবসর, ঢাকা, অষ্টম মূদ্রণ-২০১৮, পৃ. ১০৯-১১০

৮. চৌধুরী বেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৯. চৌধুরী খালিদা এবিদ, ‘মুক্তিযুদ্ধ: নির্বাচত কবিতা’, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (স), জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-২০০৮, পৃ. ৬৬-৬৭

১০. চৌধুরী মানস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১১. মোহাম্মদ রফিক, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’, আবুল হাসনাত (স), অবসর, ঢাকা, অষ্টম মূদ্রণ-২০১৮, পৃ. ১৩৫
১২. হুসাইন রবিউল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫
১৩. আহমদ মহিউদ্দিন, ‘জাসদের উত্থান পতনঃ অস্থির সময়ের রাজনীতি’, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৪, পৃ. ২৭২
১৪. ইসলাম রফিকুল, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম’, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৬, পৃ. ১০৭
১৫. সরকার শিহাব, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’, আবুল হাসনাত (স), অবসর, ঢাকা, অষ্টম মূদ্রণ-২০১৮, পৃ. ২৩৮
১৬. দত্ত বিজয়কুমার, ‘মুক্তিযুদ্ধ: নির্বাচত কবিতা’, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (স), জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-২০০৮, পৃ. ১৪৪
১৭. হক সামসুল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬
১৮. ইসলাম কবিরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯
১৯. আচার্য ফণিভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
২০. দস্তিদার ত্রিদিব, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’, আবুল হাসনাত (স), অবসর, অষ্টম মূদ্রণ-২০১৮, পৃ. ২৬৪
২১. রহমান মনিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯
২২. মিত্র প্রদীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
২৩.আবদুল আউয়াল আবু হেনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩
২৪. জাফর সিকান্দার আবু, ‘মুক্তিযুদ্ধের পঙ্‌ক্তিমালা’, লিয়াকত আলী লাকী (প্রধান সম্পা.) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০১২, পৃ. ৩৩২-৩৩৩

(ভাস্কর সেন গুপ্ত)

(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ)